সৌজন্যেঃ **স্বস্তিক ফার্মাসিউটিক্যাল**

পারিবারিক মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা

অ্যাঞ্জেল

আপনার স্বাস্থ্য ও মননের সঙ্গী

ছোটদের শিক্ষনীয় মনোরঞ্জন অনুষ্ঠান

কলকাতা, এপ্রিল সংখ্যা, ১লা এপ্রিল , ২০১৯, ১৭ই চৈত্র, ১৪২৫ সোমবার, দশম বর্ষ ১২তম সংখ্যা, ৪ পাতা, মূল্য ৪ টাকা

সন্তান ফিট হয়ে গেছে... ৩-এর পাতায় ✸ গৌড়-পাণ্ডুয়া ভ্রমণ -৪-এর পাতায় ✸ গরমে নিজেকে শীতল রাখার... -৭-এর পাতায়

নববর্ষ ও বাঙালী

দোলের রঙ হাত থেকে সবে উঠেছে কিনা, হঠাৎই ভিড় বেড়ে যায় শপিং মল থেকে শুরু করে, গড়িয়াহাট, এসপ্ল্যানেডের মার্কেটে। 'চৈত্র সেল, চৈত্র সেল' চিৎকারে কান পাতা দায় হয়। সবাই নতুন জামা-কাপড় কিনতে ব্যস্ত। নতুন বছর যে চলে এসেছে দোর গোড়ায়। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে কেনাকাটা করে চলেছে। নতুন জামা

কাপড়ে বাঙালি সেজে উঠেছে। আহ্বান জানাতে হবে তো নতুন বছরকে। তাই সকাল বেলা লক্ষী-গণেশের পুজো দিয়ে প্রসাদ খেয়েই শুরু হয় রকমারী রান্না। চাইনিজ, ইতালিয়ান খাবারকে হার মানবে ভাত-ডাল, সুক্তো, মাছ-মাংস, চাটনি পাঁপড়ের কাছে। রোজকার একঘেয়ে জীবনযাত্রার থেকে একটু আলাদা করে বাঁচার এই একটাই দিন। তাই বছরের প্রথম দিনটা বাঙালীয়ানা করে কাটানোর দিন। যে ছেলেটা ফর্মাল ছাড়া কিছু পরে না, সেও আজ পাঞ্জাবী পরে তৈরী সকাল সকাল। আর দুপুরে ভাত ঘুম একটু দিয়ে নিয়েই হালখাতা করতে যাওয়ার জন্য এক পায়ে রাজি। হালখাতা করে পাওয়া মিষ্টিগুলোর স্বাদটাই যেন অন্যরকম। আর পাঁচটা দিন স্বাস্থ্য সচেতন হওয়ার দরুণ হয়তো মিষ্টির দিকে ফিরেও তাকানো হয় না। কিন্তু এইদিন ডায়াবেটিসের রোগীরা একদিনের এই স্বাধীনতার স্বাদ পেতে পিছু পা হয় না। এই আনন্দের মুহূর্তগুলো হয়তো নববর্ষের দিনই পাওয়া সম্ভব। কারণ, এর মধ্যে জড়িয়ে আছে এক বাঙালীয়ানার আন্তরিকতা। অপেক্ষা আমরা সব কিছুর জন্যই করি, কিন্তু এই দিনটা শুধু একটা নতুন সূচনাই দেয় না, সাথে করে নিয়ে আসে নিজের ইচ্ছে মতো বাঁচার একটা দিন। যেদিন কোনো সাহেবিয়ানা চলে না। এইদিন মোটা চালের ভাতটাও অমৃত মনে হয়।

বাঙালী ও নববর্ষের মধ্যে যে নিবিড় সম্পর্ক আছে, তা নিয়ে যতই বলব ততই কম। তবে সব কথার শেষে একটাই কথা, একদিনের বাঙালী সাজ পোশাক কি মিটিয়ে দিতে পারে সারাটা বছরের হওয়া অবহেলা? পাঞ্জাবী শুধু উৎসবের পোশাক হিসেবে দাঁড়িয়েছে, কোথাও কি মনে হয় না আর একটু যত্নশীল হতে নিজের ঐতিহ্য-সংস্কৃতির প্রতি। চলুন না, এই বছর সকলে মিলে চেষ্টা করি নববর্ষের শুরুর দিন থেকে সারাটা বছরের প্রত্যেকটি দিনের সাথে নিবিড় সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে। হয়তো এই বাঙালীয়ানাই বন্ধ করতে পারে নিন্দুকদের মুখগুলো। সময় পেলে ভেবে দেখবেন। শুভ নববর্ষ

প্রতিষ্ঠা না কি আদর্শ !

যে যে গুণগুলো থাকলে সাফল্য থাকবে আপনার হাতের মুঠোয় সেগুলো হল - বিনয়ী, সংযত, ক্ষমাশীল, ধৈর্যবান, মার্জিত কথাবার্তা, পরিবর্তনশীল, মাথা গরম না করা, কোনো অজুহাত দেখিয়ে নিজের দোষ চাপা না দেওয়া, সৎ-সহজ, অন্যকে সম্মান জানানো ও অন্যের বিপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেই প্রতিষ্ঠিত ও আদর্শ ব্যক্তিত্বের সাহায্যেই গড়ে উঠবে এক সুস্থ ও আদর্শ সমাজ, কারণ আদর্শবোধ ও মূল্যবোধ না থাকলে প্রতিষ্ঠিত মানবজাতি কখনোই তৈরি হয় না, এই বিষয়ে জানালেন- ***ডাঃ কেদাররঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়***

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথায় ''নিয়মিত ধরণের স্কুলগুলি হলো এক-একটি কারখানা এবং এটিই একমাত্র পদ্ধতি যা বিশেষভাবে অভিন্ন ফলাফলগুলিকে গ্রাস করার জন্য তৈরি করা হয়েছে''। আমরা আদর্শের কথা বলতে গিয়ে কখন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কখনও আবার স্বামী বিবেকানন্দ কিংবা কাজি নজরুল ইসলাম বা কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য-এর কথা বললেও আমরা কখনোই তাদের আদর্শের কথা মনে রাখিনা বা তাঁদের দেখানো পথে চলার কথা কখনই বলি না। যখনই আমরা পথ চলার কথা বা জীবনযাত্রার কথার ভাবি, তখনই প্রথমে আমাদের মাথায় আসে ডাক্তার কিংবা ইঞ্জিনিয়ার কিংবা ১০টা-৫টার সরকারি চাকরী আর তা না হলে কোনো বেসরকারি সংস্থার চাকরী। লেখক বা কবি কিংবা শিল্পী- এই ধরণের স্বপ্নের জীবিকাগুলির কথা আমরা কখনোই ভাবতে পারি না, সে যতই আমরা গান শুনি কিংবা বই পড়ি না কেন। প্রসঙ্গত, এখনকার এই কম্পিটিশনের দিনে পড়াশোনার মূল উদ্দেশ্য হয়ে উঠেছে জীবিকা অর্জন। মোটা টাকার মাইনে পেয়ে বিলাশবহুল জীবনযাপনই এখন একমাত্র লক্ষ্য। এখন আর কেউই জ্ঞান অর্জনের জন্য পড়াশোনা করে না, এখন সবাই পড়াশোনা করে কেবলই বেশি নম্বর পেয়ে একটা মোটা মাইনের চাকরি লাভের জন্য। আর বাবা-মায়েরাও ছেলে-মেয়ের এই সাফল্যেই খুশি। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে চাওয়াটা কখনোই অন্যায় বা ভুল নয় কিন্তু এই প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দৌড়ে কোথাও যেন হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের আদর্শবোধ। বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দিনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখের জন্মদিন বা মৃত্যুদিনে মাল্যদান করলেই আদর্শবোধ প্রকাশ পায় না। একটা মানুষের আদর্শবোধ প্রকাশ পায় তার কথাবার্তা, চালচলন, আকারইঙ্গিত, অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে। আপনি যতই শিক্ষিত হোন না কেন, যতই উঁচু পোস্টে চাকরি করুন না কেন, আপনার মধ্যে যদি আদর্শবোধ না থাকে তাহলে আপনাকে কেউই পছন্দ করবে না। শুধু তাই নয়, আদর্শবোধহীন ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হতেই পারে, কিন্তু সবার কাছের বা সবার স্নেহের কখনই হতে পারে না। আদর্শবোধ শেখার বা পড়ার কিংবা মুখস্ত করার কোনো বিষয় না, আদর্শবোধ নির্ভর করে কেবলই নিজের উপর, কেউই আপনাকে তা শেখাতে পারবে না।

এখন দেখে নেওয়া যাক আদর্শ ব্যক্তিত্বের সাধারণ কিছু গুণাগুণ বা লক্ষণ

অজুহাত দেবেন না

কোনো কাজ সময়ে শেষ করতে না পারলে বা কোথায় সময় মতো পৌঁছতে না পারলে অজুহাত দিয়ে নিজের দোষ ঢাকার চেষ্টা করার চেয়ে ভালো সেইবারের মতো নিজের দোষটা মাথা পেতে মেনে নিন। সময়ের কাজ সময়ে শেষ করার চেষ্টা করুন, কোথাও পৌঁছনোর হলে আগে থাকতে হাতে সময় নিয়ে বেরোন, যাতে দেরি না হয়।

কথায় কথায় মাথা গরম করবেন না

অন্যায় দেখলে আমাদের সকলেরই মাথা গরম হয়। কিন্তু কথায় কথায় মাথা গরম করা কিংবা মাথা গরম করে অন্যের উপর চিৎকার করলে কখনোই সমস্যার সমাধান হবে না। বরং আপনি সবার কাছে ক্রমশ অপ্রিয় হয়ে উঠবেন। অতএব মাথা ঠান্ডা রাখতে শিখুন।

ক্ষমা করতে শিখুন

কে, কবে কি ভুল করেছে, তা ধরে বসে থাকবেন না বরং ক্ষমাশীল হতে শিখুন, তাহলেই দেখবেন নিজের চলার পথটা অনেক সহজ হয়ে উঠবে।

সৎ ও সহজ হতে শিখুন

সৎ পথ কঠিন হলেও সুখ ও সাফল্য লাভ কেবল সৎ পথেই পাওয়া সম্ভব। জটিল ভাষায় কথা না বলে সহজ ও সরল ভাষায় কথা বলা অভ্যেস করুন, তাতে আপনার এবং আপনার সামনের জন উভয়েরই সুবিধা হবে।

অন্যের কথা ধৈর্য ধরে শুনুন

আপনি যদি কারোর কথা ধৈর্য ধরে না শোনেন তাহলে মনে রাখবেন, আপনার সামনের জনও আপনার কথা শুনবে না। হতে পারে আপনার সামনের জন ভুল বলছে কিন্তু তাও ধৈর্য না হারিয়ে তার কথা শুনুন, প্রয়োজনে ভুলটা সংশোধন করে দিন।

সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন

অন্যকে বিপদে দেখে সেই নিয়ে কৌতুক না করে তার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন। আপনিও একদিন বিপদে পড়তে পারেন। আজ আপনি যদি কাউকে সাহায্য করেন কাল সে হয়তো আপনার বিপদের দিনে আপনার পাশে দাঁড়াবে।

বিনয় ও নম্রতা আনুন কথাবার্তায়

সবসময় চিৎকার করে, ঝগড়া করে সমস্যার সমাধান হয় না, এতে বরং সবাই আপনার থেকে দূরে সরে যাবে। বিনয় ও নম্রতার সাথে কথাবার্তা বলুন, তাতে করে আপনার কার্যোদ্ধারও হবে অথচ কারোর মনে কোনও রাগ বা ক্ষোভ থাকবে না।

সংযত হন

সব জায়গায় সব ধরণের কথা বলা যায় না, জায়গা ও লোক বুঝে কথাবার্তা বলুন, নিজের কথাবার্তায় সংযত হন। এতে আপনার সম্মানও অক্ষুন্ন থাকবে।

হতে হবে পরিবর্তনশীল

সময়ের সাথে সাথে নিজেকে বদলাতে শিখুন, এতে করে আপনি যেমন নতুন কিছু জানতে ও শিখতে পারবেন তেমনই সকলের থেকে পিছিয়েও থাকবেন না।

অন্যকে সম্মান করতে জানতে হবে

আপনি যদি অন্যকে সম্মান না দিতে পারেন তাহলে আপনি যতই শিক্ষিত হন না কেন আপনাকেও আর কেউই সম্মান করবে না। মনে রাখবেন কোনো কাজই ছোট নয় তাই সকলকেই সম্মান দিতে শিখুন, দেখবেন, অন্য সবাইও আপনাকে যথাযথ সম্মান দিচ্ছে।

অ্যাঞ্জেল

দশম বর্ষ ১১তম সংখ্যা, শুক্রবার ১৬ই ফাল্গুন ১৪২৫, কলকাতা

খাদ্যে ভেজাল, মরছে মানুষ! নিরাপদ খাদ্য- দাবি নয়, অধিকার

আহা, কী ভয়ঙ্কর! এ কেমন সমাজে বাস করছি আমরা, যেখানে মানবতা ও মনুষ্যত্ববোধ চরমভাবে লাঞ্ছিত। বিবেক যেখানে অর্থের কাছে সমর্পিত। আমাদের প্রিয় সন্তান, পিতামাতাসহ আপনজনদের সুস্বাস্থ্য আর সুস্থ ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনায় প্রতিদিন যেন বিষের পেয়ালা তুলে দিচ্ছি তাদের মুখে, যা ভক্ষণ করে আমরা তিলে তিলে খুন হচ্ছি, খুন হচ্ছে জীবনীশক্তি। আমাদের নৈতিক চরিত্র কি এতই নিচে নেমে গেছে! বিবেক বলে কি আমাদের কিছুই নেই! তাহলে আমরা নিজেদের মানুষ দাবি করব কোন অধিকারে? লাভটাই কি আমাদের কাছে সবচেয়ে বড়!

খাবারে বিষ বা ভেজালের ক্ষতি সমাজের জন্য মাদকের চেয়েও ভয়ঙ্কর পরিণতি ডেকে আনতে পারে। কারণ, মাদক যার প্রয়োজন সে সেবন করে। তবে মাদকাশক্তির কুপ্রভাবে সমাজকে নানাভাবে **অসহিষ্ণু** করে তোলে। আর মাদকের বিষ ছড়িয়ে পড়ে সমাজে কিন্তু খাদ্যে ভেজাল তার চেয়েও ভয়ঙ্কর। কারণ, বেঁচে থাকার জন্য আমাদের খেতেই হবে। বাজারে কত প্রকারের খাবার ও খাদ্য সামগ্রীতে ভেজাল ও নিম্নমানের খাদ্য সামগ্রীর অবাধ ব্যবহারে বছরে দ্বিগুণ হারে বিভিন্ন মরণব্যাধি বাড়ছে বলে জানিয়েছে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। এরকম অবস্থা থাকলে আগামী ২০২০ সালের মধ্যে দেশে মরণব্যাধি মহামারী আকার ধারণ করবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছে। কিডনি, লিভার, শিশু, গাইনি ও ক্যানসার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা বলেছেন, ভেজাল খাদ্যসামগ্রীর আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রয়োগ করা অনিবার্য হয়ে পড়েছে। পাবলিক হেলথ ইনস্টিটিউটের পরীক্ষকদের মতে, বিষাক্ত নকল ট্যাং ও চকোলেট খেলে শিশু বা বয়স্ক যেকোনো মানুষের দ্রুত কিডনি নষ্ট, ক্যানসার, লিভার ব্যাধি, দীর্ঘমেয়াদি পেটের পীড়া, ডায়েরিয়া, শিশুদের হার্টের রোগ এবং দৃষ্টিশক্তিও হ্রাস পেতে পারে। জানা গেছে, চাইনিজ রেস্টুরেন্ট গুলোতে খাবারকে সুস্বাদু করতে মাত্রাতিরিক্ত টেস্টিং সল্ট ব্যবহার মানুষের শরীরের জন্য বিশেষ করে গর্ভবতী মহিলাদের ভয়ঙ্কর ক্ষতির কারণ। এ ধরণের খাদ্যগ্রহণে গর্ভজাত শিশু বিকলাঙ্গ, এমনকি গর্ভপাতও হতে পারে।

বিভিন্ন সময়ে ভেজাল বিরোধী অভিযান চালিয়ে খাবার উপাদানকারী প্রতিষ্ঠান ও নকল ওষুধ তৈরির কারখানায় অভিযান চালিয়ে খাদ্যদ্রব্য চাল, ডাল, আটা, মুড়ি থেকে শুরু করে শিশুখাদ্য গুঁড়োদুধ, তরল দুধ, দই, আইসক্রিম, চকলেট, জুস, জেলি, কোল্ডড্রিঙ্কস, মিষ্টি, ঘি, হোটেলের খাবার, ফলমূল, শাকসবজি, মাছ-মাংস, মুরুগি, ওষুধ, জর্দা, ওরাল স্যালাইন, ভোজ্যতেল, বেকারির খাদ্যসামগ্রী ও কসমেটিক সহ শতাধিক রকমের পণ্যসামগ্রীতে ভেজাল খুঁজে পাওয়া গেছে।

এসব শুনে আঁতকে উঠতে হয়! আমরা কী খেয়ে আসছি এতদিন? কীভাবে বেঁচে আছি? কেন অধিক লাভের লোভে প্রজন্মের মুখে তুলে দিচ্ছি বিষের পেয়ালা? এভাবে যারা নির্বিচারে খাবারে বিষ মেশায় তারা খুনি। প্রজন্মের শত্রু! তাদেরকে শুধু জেল-জরিমানা নয়, সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ডের বিধান দিয়ে দ্রুত আইন চালু করা জনগনের প্রাণের দাবি। তাদের শাস্তি হোক দৃষ্টান্ত মূলক, যাতে আর কেউ খাবারে ভেজাল করে বা বিষ মিশিয়ে প্রজন্মকে মেধাশূণ্য আর অসুস্থ করে তুলতে না পারে। কেন না নিরাপদ খাদ্য দাবি নয়, অধিকার।

তাহাদের কথা

যতদিন যাচ্ছে, মানুষ উন্নতির শিখরে পৌঁছে যাচ্ছে। যেখানে যন্ত্রই শেষ কথা। ফোনের একটা টাচে গাড়ি পাওয়া থেকে শুরু করে বাড়িতে খাওয়ার পৌঁছে যাওয়া। যন্ত্রদানবই মানুষকে সম্পূর্ণ বস করে রেখেছে। যখন বিজ্ঞান এত উন্নত তখন বিজ্ঞান উন্নতির পথে এগোতে এগোতে প্রাকৃতিক নিয়মে মৃত্যুকে হার মানাতে উঠে পড়ে লেগেছে। বিভিন্ন ওষুধ আবিষ্কার হচ্ছে, যা দিয়ে হার মানছে মারণ রোগ। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই আমরা ভাবিও না কয়েকটি ওষুধ কিভাবে তৈরী হয়। নিজে সুস্থ থাকলেই হবে, এই ভেবে কত বন্য প্রাণকে ধ্বংসের পথে এগিয়ে দিচ্ছি।

দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার অধিবাসী গৌড় বা ভারতীয় বাইসন। যা মোষের তুলনায় অনেক ক্ষেত্রেই আলাদা দেখতে হয়। গবাদি পশুর মধ্যে এরা সবচেয়ে বড় মাপের। গবাদি হলেও এরা বাকি পোষ্যদের মতো শান্ত নয়, একটু বন্য প্রকৃতির। মালয়েশিয়াতে এরা সিলাডাঙ নামেই পরিচিত। অন্য গবাদি পশুর তুলনায় এরা অনেক বেশি শক্তিশালী হয়। মাথায় বড় দুটো শিং থাকে, যার মাঝে হলদেটে গোছের রঙের বড় বড় লোম থাকে, যার নিচে ঢেকে থাকে তাদের কপালের অংশ। লেজটা তুলনায় একটু ছোট আকৃতির হয়। অনেকটা জোরে দৌড়াতে পারে। কাঁধের পরিমাপ লেজের তুলনায় বড়। তাই কাঁধের মাংসপেশির পরিমাণ বেশি। সারা শরীর ছোট, উজ্জ্বল লোম দিয়ে আবৃত্ত থাকে। এরা সাধারণত দৈর্ঘ্যে প্রায় ২৫০ থেকে ৩০০ সেন্টিমিটার এবং কাঁধের পরিধি প্রায় ১৪০ থেকে ২২০ সেন্টিমিটার হয়। প্রাপ্ত বয়স্ক একটি বাইসনের ওজন প্রায় ১০০০ থেকে ১৩০০ কেজি হয়। বাইসনের সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার এদের গলকম্বল বা গলা, বুক কিছু আলাদা করে থাকে না। মাথার দুপাশ দিয়ে শিং বের হয়। একটি গরুর শিং-এর তুলনায় বাইসনের শিং বড় ও অনেক বেশি শক্ত হয়।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এদের গায়ের রঙ গরুর রঙের তুলনায় গাঢ় হয়। খাদ্য তালিকার মধ্যে ছোট ঘাস, পাতা, ফলের বীজ, ফল সব কিছুই থাকে। একটি দল বানিয়ে থাকলেও এদের মধ্যে যুদ্ধ করার প্রবণতা তুলনায় অনেক কম। জন্মের পর ছোট বাইসন তার মায়ের সাথে প্রায় ১২ মাস মত থাকে।

এরা সাধারণত জঙ্গল এলাকায় থাকতে ভালোবাসে। কারণ সেখানে জল ও খাবার দুটোরই অভাব না থাকার কথা। গরম কালে জলাশয়ে নামে, শরীর ঠান্ডা রাখতে। পাহাড়ি অঞ্চলের বাইসনগুলো গরম কালে পাহাড়ের ওপর দিকে উঠতে থাকে।

অপরিকল্পনীয়ভাবে বনাঞ্চল কেটে ফেলা এবং এই প্রাণীগুলি থেকে ওষুধ তৈরী ও মাংসের জন্য হত্যা করার কারণে এরা বিলুপ্তির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। ১৯৯০ সালে থাইল্যান্ড, ভিয়েতনামের মত জায়গাগুলিতে অভাবনীয় হারে গৌড় হত্যা করার কথা শিরোনামে আসে। এর কিছু সাল পরেই এদের জীবন সংকটাপন্ন তা জানিয়েছে আইইউসিএন-এর পক্ষ থেকে। এখন অনেক পদ্ধতিতে এদের সংরক্ষণের চেষ্টা চলছে।

ছায়াছবির অন্তরালে

একটা সময় ছিল যখন সিনেমার পরিচালকরা সিনেমার মধ্যে দিয়ে তুলে ধরত রূঢ় বাস্তবকে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর থেকে শুরু করে শোষিত হওয়া শ্রেণীর জীবনযাপনের কথা। এই ধরণের সিনেমাগুলো সেই মূহুর্তে কেউ দেখতে না গেলেও এই সব সিনেমা এখন কালজয়ী রূপেই খ্যাতি অর্জন করেছে। আর তার জন্যই হয়তো পরিচালকেরা সেই ধরণেরই সিনেমা বানাতে চায় যা দর্শকের মনে একটা গভীর ছাপ ফেলে। কারণ, সিনেমাই হয়তো কোনও এক বিনোদনের জায়গা যা দর্শককে টানা ২-৩ ঘন্টা এক জায়গায় চুপ করে বসিয়ে রাখতে পারে। সিনেমার আরও একটা ভালোগুণ বলা যেতে পারে যে, একটাই বক্তব্য একসাথে অনেক দর্শকের কাছে একই সময় পৌঁছে দেওয়া যায়। তাই হয়তো খুব কঠিন কিছুও খুব সহজেই বলা যায়। আজ তেমনি একটি সিনেমার কথা জানব, যেখানে সামাজিক একটি বার্তা যা মুখে বললে খুব কঠিন হয়ে যাবে, তা কত সহজেই হাজার হাজার দর্শকের কাছে অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হল।

২০০৯ সালে মুক্তি পাওয়া ১৩৩ মিনিটের 'পা' সিনেমার পরিচালক আর. বালাকৃষ্ণণ, যাকে আর. বালকি বলেই সবাই জানে। সিনেমার মূখ্য চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা গেছে অমিতাভ বচ্চন, অভিষেক বচ্চন ও বিদ্যা বালানকে। সিনেমার গল্পে দেখা যায়, অমিতাভ বচ্চনকে ১২ বছরের শিশুর চরিত্রে, যার নাম অউরো। তার মা নাম বিদ্যা, একজন গাইনিকোলজিস্ট এবং তার বাবা একজন পলিটিশিয়ান, যে কিনা সবার কাছে প্রমাণ করতে চায় রাজনীতি কোনও ভাবেই খারাপ নয়, সে নিজের এই আদর্শে অনড়। গল্পের মুখ্য চরিত্র অউর যে কিনা একটি বিরল রোগে আক্রান্ত, যার নাম - প্রোজেরিয়া। এই রোগে আক্রান্ত শিশুর মাথা শরীরের তুলনায় অনেক বড় হয়। আর শিশু শুধু শারীরিক ভাবে অসুস্থই হয় না, তাকে দেখতে তার বয়সের তুলনায় পাঁচ গুণ বড় মনে হয়। এমন শিশুদের অন্য শিশুদের সাথে মানিয়ে নিতেও সমস্যা হয়। অউর বুদ্ধিমান ও পড়াশোনাতেও উজ্জ্বল। সে জানত না তার বাবার কথা। স্কুলের একটি অনুষ্ঠানে অমল আসলে সেখান থেকেই পরিচয় হয় তাদের এবং গল্প ঘটনাক্রমে এগিয়ে যায়। সব থেকে বড় বিষয় এই সিনেমাতে দেখা যায় অউর মা ভুল সময় অ্যাবরশন করার চেষ্টা করার কারণেই এত বড় ঘটনা ঘটে। কিন্তু অন্যদিকে আবার দেখা যায় যে, অবিবাহিত এবং একা হওয়া সত্ত্বেও অউরকে সে কখনই একা হতে দেয়নি বা চিকিৎসার কমতি রাখেনি। অবিবাহিত মা সাথে তিনি প্রথম থেকে এও জানতো অউর বেশিদিন বাঁচবে না, তারপরও মাতৃ স্নেহ থেকে সে কখনই বঞ্চিত করেনি। এমনকি অমল যে ১২ বছর পর্যন্ত জানতই না তার একটা ছেলে আছে, যে কিনা এত অসুস্থ, তার কাছ থেকেও কোনও আশা রাখেনি বিদ্যা।

প্রায়ই শিশু কন্যা, অসুস্থ শিশু বা অসময়ে শিশু জন্মানোর কারণে তাকে হত্যা করা বা ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়ার মতো ঘটনা ঘটছে। সেখানে দাঁড়িয়ে 'পা' অবিবাহিত মায়ের লড়াই তুলে ধরছে সমাজের সামনে। একটি অসুস্থ শিশুর পাশে থাকলে সেও একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সাক্ষী হতে পারে, এইটাই সিনেমার মূল বক্তব্য।

তরমুজের গুণাগুণ

ফ্যাট এবং কম মিষ্টির জলজ এই ফলের আদি বাসস্থান পশ্চিম আফ্রিকা হলেও গঠন, আকার ও রঙের উপর ভিত্তি করে সারা পৃথিবীতে প্রায় ৫০টিরও বেশী ভিন্ন প্রজাতির তরমুজ দেখতে পাওয়া যায়। তরমুজকে সাধারণত চারটি ভাগে ভাগ করা হয়, যেমন- বীজহীন তরমুজ, পিকনিক তরমুজ, আইসবক্স তরমুজ, হলুদ বা কমলা শাঁসের তরমুজ। পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ক্যারটিনয়েড, ভিটামিন-বি১, বি৫, বি৬, ভিটামিন-সি, ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ এই ফলের বিজ্ঞানসম্মত নাম - **সিট্রুলাস ল্যানটাস**। প্রায় ৯২ শতাংশ জল পূর্ণ হওয়ায় এই ফল শরীরকে জলোজিত রাখতে সাহায্য করে। এছাড়াও তরমুজে রয়েছে নানান উপকারিতা। জেনে নেওয়া যায় তরমুজের নানাবিধ গুণের কথা-

ম্যাকুলার অবনতি প্রতিরোধ করে

তরমুজে উপস্থিত লাইকোপিন চোখকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে এবং বয়স জনিত ম্যাকুলার ডিজেনেশন (এ.এম.ডি) থেকেও রক্ষা করে। লাইকোপিন অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট হিসাবে কাজ করে এবং বেদনা প্রশমেও বিশেষ কার্যকারি।

হৃৎপিন্ডের স্বাস্থ্যোন্নতি

তরমুজে উপস্থিত লাইকোপিন, মিনারেল এবং আরও অন্যান্য যৌগ হৃৎপিন্ডকে সুস্থ ও দীর্ঘজীবী করতে সাহায্য করে।

ক্যানসার প্রতিরোধক

ক্যুবারবিটাসিন-ই এবং লাইকোপিন সহ আরও অন্যান্য যৌগ থাকায় তরমুজ ক্যানসার প্রতিরোধ করতে সক্ষম।

শরীরকে জলোজিত রাখে

প্রায় ৯২ শতাংশ জল পূর্ণ হওয়ায় তরমুজ শরীরকে জলোজিত রাখতে সাহায্য করে এবং দেহে জলের চাহিদাও মেটায়।

অক্সিডেটিভ স্ট্রেস ও উচ্চ রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে

তরমুজে উপস্থিত ভিটামিন-সি এবং লাইকোপিন উচ্চ রক্তচাপ ও অক্সিডেটিভ স্ট্রেস কমাতে সাহায্য করে।

পেশীর বেদনা উপশম করে

ব্যায়ামের পর তরমুজের রস পান করলে মুক্তি পেতে পারেন পেশীর বিষন্নতা থেকে। ব্যায়ামের পর এই ফলের রস পেশীর বেদনা কমিয়ে আপনার শরীর ও মনকে করে তুলবে ফুরফুরে ও তরতাজা।

হজম ক্ষমতা বৃদ্ধি করে

ফাইবার ও জল দুই দেহের হজম ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। তরমুজে এই দুই উপাদানই বর্তমান। অতএব হজমের সমস্যা এড়াতে তরমুজ খাওয়ার অভ্যাস করুন।

চুল ও ত্বককে সুস্বাস্থ্য প্রদান করে

তরমুজে উপস্থিত ভিটামিন-এ এবং সি ছাড়াও বেশকিছু পুষ্টিগুণ আছে যা আপনার চুল ও ত্বককে সুস্বাস্থ্য প্রদান করে। শুধু তাই নয় স্নানবার্ন থেকেও আপনার চুল ও ত্বককে রক্ষা করে।

আমার সন্তান হঠাৎ ফিট হয়ে গেছে

ডঃ তন্ময় মিত্র, বিশিষ্ট সাইকোলজিস্ট

আমাদের ক্লিনিকে অনেক সময়েই বাবা-মা তাদের ছেলে বা মেয়েকে নিয়ে আসেন এই ফিটের সমস্যা নিয়ে। 'ডাক্তারবাবু- ও মাঝে মধ্যেই ফিট হয়ে যায় আধঘন্টা বা একঘন্টার জন্য, তখন কোনো সাড় থাকেনা। হাত-পা ছেড়ে দেয় - অবশ হয়ে যায়। মাথায় জল দিতে হয় - তারপর জ্ঞান ফেরে, কিন্তু তারপরে পড়াশুনা করতে পারেনা'। কখনও বলেন গত দুবছর হচ্ছে, কখনও দু-মাস, কখনও প্রতিদিন, কখনও মাসে এক বা দু-দিন। জিজ্ঞাসা করে জানা গেছে, পাবলিক প্লেসে কখনও হয় না, অন্যের উপস্থিতিতে বা যখন অন্যেরা কাছাকাছি থাকে।

এগুলি সত্যিকারের মৃগী রোগের লক্ষণ নয়। জেনে রাখা ভালো, সত্যিকারের মৃগী (এপিলেপসি)-এর লক্ষণ বা ধরন কি কি।

যাইহোক, যে মানুষটি তার সামনে প্রথমবারের জন্য খিঁচুনি দেখছেন সেটা তাঁর পক্ষে খুবই অস্বস্তিকর। তবে খিঁচুনি দেখে আতঙ্কিত হবার কিছুই নেই। ঠান্ডা মাথায় এগুলো করবেন।

জোর করে মানুষটিকে সরানোর চেষ্টা করবেন না। একমাত্র যদি রাস্তায় যেখানে গাড়ি চাপা পড়ার সম্ভাবনা আছে বা জলের মধ্যে যেখানে ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাহলে সেখান থেকে তাকে সরিয়ে দেবেন। বরং যেখানে খিঁচুনি হচ্ছে, মানুষটির আশপাশ থেকে চেয়ার, টেবিল, ছুরি, কাঁচি, কাটারি যেগুলোতে আঘাত লাগতে পারে সেগুলো সরিয়ে দেবেন।

যদি সে খালি মেঝেতে শুয়ে থাকে, সম্ভব হলে মাথার নিচে নরম কিছু জিনিস, তোয়ালে, গামছা, চাদর ভাঁজ করে দেবেন। তাহলে মাথায় আঘাত লাগার সম্ভাবনা কমবে।

গলায় যদি কোনো পোশাক আটোসাঁটো করে বাঁধা থাকে তা আলগা করে দিন। যেমন কলার টাই, ওড়না।

খিঁচুনি বন্ধ হয়ে গেলে এবং তিনি যদি অজ্ঞান থাকেন তবে একপাশ ফিরে কাত করে শুইয়ে দেবেন। তাহলে মুখে জমে থাকা লালা গড়িয়ে পড়বে, শ্বাস নিতে সুবিধা হবে।

তাঁর সাথে থাকুন, জ্ঞান ফিরলে আস্তে আস্তে কথা বলুন যাতে তিনি ঘাবড়ে না যান।

খিঁচুনি কখন শুরু এবং শেষ হল সময়টা লিখে রাখুন।

কখনোই মুখের মধ্যে কিছু দেবেন না (চাবি, আঙুল)। যতক্ষণ না পুরোপুরি সুস্থ হচ্ছে কখনোই কোনো খাবার বা পানীয় দেবেন না?

হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য কখন অ্যাম্বুল্যান্স ডাকবেন?

১) যদি আপনি নিশ্চিত থাকেন যে, আক্রান্ত ব্যক্তির এটাই প্রথম খিঁচুনি হল;

২) যদি পাঁচ মিনিটের বেশি সময় ধরে খিঁচুনি হয;

৩) যদি আক্রান্ত মানুষটির পুরোপুরি জ্ঞান না ফেরে বা পুরোপুরি জ্ঞান ফেরার আগেই বারবার খিঁচুনি হয়;

৪) যদি খিঁচুনির সময় মানুষটি ভয়ংকরভাবে আহত হন।

মনে রাখবেন, মৃগী রোগীকে প্রত্যেকবার খিঁচুনির জন্যেই হাসপাতালে যেতে হয় না। অনেকে নিজের সাথে একটা কার্ড রাখেন যাতে লেখা আছে তিনি মৃগী রোগী। এটা আছে কিনা সেটা খেয়াল করবেন।

কতগুলো বিষয় খেয়াল করে সম্ভব হলে লিখে রাখবেন-

এগুলি সেই মানুষটি এবং তার ডাক্তারের জন্য চিকিৎসার সময় গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে-

- ❒ খিঁচুনি হওয়ার আগে মানুষটি কি করছিলেন;
- ❒ খিঁচুনির সময় মানুষটির কোনও অস্বাভাবিক অনুভূতি হয়েছিল কি? যেমন- স্বাদ বা গন্ধের;
- ❒ আপনি কি এই সময় মানুষটির মেজাজের কোনও পরিবর্তন দেখেছিলেন? যেমন- উত্তেজনা, রাগ, উদ্বেগ।

কী দেখে বুঝলেন লোকটির সমস্যা হচ্ছে?

কোনও আওয়াজ, যেমন- কেউ পড়ে গেলে, খিঁচুনির জন্য, অন্য কিছুর সাথে লেগে যাওয়ার আওয়াজ অথবা চোখ উল্টে যাচ্ছে বা ঘাড় বেঁকে যাচ্ছে।

এগুলো সম্ভব হলে জানা ভালো-

- ❒ কোন সতর্কতা ছাড়াই কি হঠাৎ খিঁচুনি আরম্ভ হল?
- ❒ মানুষটি কি অজ্ঞান হয়ে গেছিলেন বা ঘোরের মধ্যে ছিলেন?
- ❒ মানুষটির শরীরে 'রঙের' কোনও পরিবর্তন হয়েছিল, যেমন ফ্যাকাশে, লাল বা নীল হয়ে যাওয়া। হলে কোথায় হয়েছিল- মুখ, ঠোঁট না হাত।
- ❒ দেহের কোনও অংশ শক্ত হয়ে গিয়েছিল বা ঝাঁকুনি দিয়েছিল কিনা? হলে কোন অঙ্গ।
- ❒ শ্বাস নেওয়ার কোনও পরিবর্তন হয়েছিল কিনা।
- ❒ অন্য কোনও কাজ করার মতো করেছিলেন কিনা? যেমন-বিড়বিড় করা, এদিক-ওদিক চলে যাওয়া, কাপড় টানছিল কিনা।
- ❒ কত সময় ধরে খিঁচুনি হয়েছিল।
- ❒ প্রস্রাব, পায়খানা করে ফেলেছিল কিনা।
- ❒ জিভ কেটে গিয়েছিল কিনা।
- ❒ খিঁচুনির পর কেমন ছিলেন?
- ❒ এরপর কি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন? ঘুমোলে কতক্ষণ?

রাস্তাঘাটে, অফিসে স্কুল-কলেজে অনেক ক্ষেত্রেই আমরা খিঁচুনি রোগী দেখি। আমাদের করণীয় সেগুলি এই নির্দেশিকা অনুযায়ী মাথায় রাখলে আক্রান্ত ব্যক্তিটিকে সাহায্য করা যাবে।

মনে রাখবেন, খিঁচুনি হচ্ছে বলেই রোগী মৃগীতে আক্রান্ত এটা ঠিক নয়। ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান। সঠিক চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে গিয়ে রোগীর পরীক্ষা করে নিশ্চিত হন সে কোন রোগে আক্রান্ত। এছাড়াও যাদের মৃগী রোগী সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই, তারা রোগীর খিঁচুনির সময় অযথা গোল করে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকবেন না। তাতে অহেতুক উত্তেজনার সৃষ্টি হবে। মৃগী রোগীকে খিঁচুনির পর স্বাভাবিক হতে সাহায্য করুন।

মানসিক সমস্যার রোগীরা অনেকসময় এইধরণের ফিটের সমস্যা নিয়ে আসে। এর সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু সমস্যা, যেমন- হাত-পায়ের সাড় চলে যাওয়া (প্যারালিসিস), অন্ধত্ব অথবা বধির হয়ে পড়ার মতো লক্ষণও দেখা দেয়। এইগুলি কিন্তু নার্ভের রোগ নয়- এর উপসর্গগুলি মানসিক সমস্যাজনিত। রোগীর নিকট আত্মীয়রা নিয়মিত ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ রাখুন। রোগী যেন মানসিক চাপে না থাকে সেদিকে নজর রাখুন। রোগীর খাওয়া-দাওয়া, খাদ্যতালিকা মেনে করুন। বাড়ির পরিবেশ সুস্থ রাখুন, রোগীর সামনে তার অসুস্থতা নিয়ে বারবার আলোচনা করবেন না। তাতে রোগী মানসিক অশান্তিতে ভুগতে পারে।

দূরে কোথাও

গৌড়-পান্ডুয়ায় লুকোচুরি

একদিকে দিগন্ত বিস্তৃত আমের বাগান। অপরদিকে গৌড় আর পান্ডুয়ার হাতছানি দিচ্ছে ইতিহাস। গৌড়-পান্ডুয়ার নানান লুকোচুরির ইতিহাস থাকছে এই প্রতিবেদনে।

ইসলামিক যুগে গৌড় ছিল বেশ সমৃদ্ধশালী নগর। সপ্তদশ শতকে বাংলার রাজা শশাঙ্ক এবং পাল রাজা গোপালের রাজধানী ছিল এই গৌড়ে। তবে সেন বংশের রাজত্বকালে লক্ষণ সেন এই গৌড়ের নাম পরিবর্তন করে লক্ষণবতী নাম দেন। পরবর্তীকালে মুঘল সম্রাট আকবর গৌড় দখল করে এবং নিজের মনের মতো করে সাজান গৌড়কে। আকবরের সময় গৌড়ে প্রায় দুশোটি পরিবার বাস করত। ইতিহাসের অনেক যুদ্ধের সাক্ষী এই গৌড়। তবে সব থেকে বড়ো কথা উত্তর ভারতে যে সমস্ত প্রাচীন দূর্গ বা প্রাসাদ আছে সেগুলির হাতের কাজের সঙ্গে গৌড়ের প্রাসাদের গায়ের কাজ অনেকটাই ভিন্ন। সম্পূর্ণ লাল ইট আর বালি সুরকি দিয়ে তৈরি এই প্রাসাদ। ইটের গায়ে টেরাকোটার কাজ।

গৌড় প্রাসাদ থেকে মিনিট সাতেকের হাঁটাপথে রয়েছে ছোট সোনা মসজিদ। এছাড়াও পাশে আছে তাঁতি পাড়া ও লোটান মসজিদ। ছোট সোনা মসজিদের মূল আকর্ষণ কিন্তু মসজিদের গায়ে ইটের ওপরে টেরাকোটার কাজ। এরপর যাওয়া যাক বড়ো সোনা মসজিদ। সবই হাঁটা পথ। তথাকথিত, এখনকার মসজিদের মতো নয়। প্রাচীনকালে এগুলি রাজারাজড়াদের ধর্মস্থান ছিল এখন সবই ইতিহাসের নিদর্শন হয়ে হেরিটেজ নামে খ্যাত। ১৫২৬ পানিপথের প্রথম যুদ্ধের সময় নসরত শাহ বড়ো সোনা মসজিদ তৈরি করেন। তখন ৪৪টি গোম্বুজ সোনা দিয়ে মুড়ে দেন নসরত শাহ। এখন আর সোনা নয় ইট গায়ে কাজ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বড়ো সোনা মসজিদ। মসজিদে ঢোকার পথে ১২টি দরজা আছে। আপনি যদি যেকোনো একটি দরজার সামনে দাঁড়ান তাহলে ১২টি দরজাকেই একসঙ্গে দেখতে পাবেন।

এবার চলুন ঢাকিল দরওয়াজা বা সেলিম দরওয়াজা। এটি তৈরি করেন বরবক শাহ। ফতেপুর সিক্রির বুলান দরওয়াজার আদলে তৈরি। সেলিম দরওয়াজার দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্ত থেকে প্রায় চারপাশটা ২০ ফুট উচুঁ লম্বা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। নবাবদের নিজস্ব মসজিদ কোডাম রসুল প্রবেশের জন্য তৈরি করা হয়েছিল সেলিম দরওয়াজা। আয়তক্ষেত্র আকারের বড় গোম্বুজ বিশিষ্ট এই মসজিদ ১৫৩০ সালে সুলতান নসরত শাহ তৈরি করেন। মসজিদের ভিতরে সাদা পাথরের ওপর ঈশ্বরের পায়ের ছাপ দেওয়া বেদী, যা শান্তির পরিচয় দেয়। যে সময় মসজিদের চারপাশে দো-চালার আকৃতি বানিয়ে দিয়েছিলেন ফতে খান। যা আজও ভগ্নপ্রায় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কোডাম রসুল মসজিদের পূর্বদিক দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বেরিয়ে যেতে পারেন ত্রিস্তরের লুকোচুরি দরওয়াজায়। ১৬৫৫ সালে শাহ সুজা লুকোচুরি দরজা তৈরি করেন। স্থানীয় মানুষদের কাছে প্রচলিত আছে নবাব তাঁর বেগমকে নিয়ে এখানে লুকোচুরি খেলতেন। নবাব যখন লুকোচুরি খেলেছেন, আপনিও কি খেলবেন? তবে অবশ্যই মনের মতো সঙ্গীকে নিয়ে। লুকোচুরি খেলতে খেলতে চলুন গামতি দরওয়াজা ও চিকা মসজিদে। চিকা মসজিদে এখনও হিন্দুদেবদেবীর মূর্তি আছে। গৌড় থেকে শুরু করে আশপাশের যত মসজিদ আছে সবটাই ২২ গজ দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। ১৪৬০ সালে প্রাসাদ এবং মসজিদগুলিকে শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বরবক শাহ প্রাচীর দিয়ে পরিখা তৈরি করেছিলেন। বর্তমানে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের অধীনে এই প্রাচীর। বৌদ্ধধর্মের কিছু নকশার হদিশ মিলেছে ২২ গজ দেওয়ালের গায়ে। গৌড় ঘুরতে ঘুরতে হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ যুগের ভগ্নস্তুপের ঐতিহাসিক নিদর্শনের সাক্ষীও হলেন। গৌড় প্রাসাদ, মসজিদ দেখার পর চলুন অন্যতম আকর্ষণীয় স্থান ফিরোজ মিনার। না, কুতুব মিনারের মতো অতো উঁচু নয়। ১৪৯৮ সালে দ্বিতীয় ফিরোজ শাহ বরবক শাহের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এটি তৈরি করেন। প্রায় ৪৮টি সিঁড়ি বেয়ে চটপট উপরে উঠতে পারেন। গৌড় বা মালদা শহরের খানিকটা ওপর থেকে দেখার জন্য, ওপরে ওঠার পথটা খুব একটা প্রশস্ত নয়। তবে ওপরে ওঠার জন্য সঙ্গী যদি কেউ না থাকে চিন্তা করবেন না, সঙ্গী হবে চামচিকির সুগন্ধ।

পান্ডুয়া

১৩৩৯ সালে আল-আ-দিন-আলিশাহ গৌড় থেকে রাজধানী পান্ডুয়ায় সরিয়ে নিয়ে যান। তিনি তাঁর রাজধানীর নতুন নামকরণ করেন ফিরোজাবাদ। বর্তমানে পুরাতত্ত্ব বিভাগ গৌড় বা পান্ডুয়াকে হেরিটেজ এলাকা বলে ঘোষণা করেছে। গৌড় প্রাসাদের মতো সুন্দর পান্ডুয়ার প্রাসাদও। বর্তমানে গৌড় ও পান্ডুয়ার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ আদিনা মসজিদ। সুলতান ইলিয়াশ শাহ দিল্লির জুম্মা মসজিদের আকারে তৈরি করেন। আদিনা মসজিদ তার অসাধারণ সৌন্দর্য ও পুরাকালের নিদর্শন নিয়ে আমাদের কাছে আকর্ষণীয়।

আদিনা মসজিদের আসেপাশে রয়েছে বাদশা-কা-যাকি, একালাকী কবর, কুত্যুব শাহি মসজিদ। গৌড়ের চিকা মসজিদের আদলে তৈরি কুত্যুব শাহি মসজিদ। ইতিহাস বলছে, প্রায় পঞ্চাদশ শতকে বাংলার রাজধানী ছিল ফিরোজাবাদ বা আজকের পান্ডুয়ায়। প্রাচ্য-মধ্যপ্রাচ্য থেকে বহু ধর্মপ্রাণ, ঈশ্বর বিশ্বাসী মানুষ আসতেন আদিনা মসজিদ দর্শনে।

যাইহোক, গৌড় বা পান্ডুয়া থেকে এবার ফেরার পালা। গৌড় থেকে ফেরার পথে দেখতে পারেন জহুরা কালি মায়ের মন্দির। আমবাগানের মধ্যে শান্ত পরিবেশ হঠাৎ গা ছমছম করবে কালি মায়ের মূর্তি দেখে। শহরের আশপাশে ছড়িয়ে আছে এমন অনেক কিছু যা সমুদ্রে বা পাহাড়ে নেই। বড়সড় জঙ্গল নেই। বড়ো নদী বলতে আছে মহানন্দা। সেখানেও সৌন্দর্য যত না আছে, তার চেয়ে বেশি আছে ভয়াবহতা। গ্রামের পর গ্রাম তলিয়ে যায় মহানন্দার ভাঙনে। তাই চোখ জুড়ানো সৌন্দর্য হয়তো পাবেন না। কিন্তু পরতে পরতে পাবেন ইতিহাসের গন্ধ। দেখার চোখ এবং বোঝার মন দুই দরকার।

কীভাবে যাবেন

যাঁরা মালদা থেকে যেতে চান, তাঁদের জন্য অনেক ট্রেন আছে। শিয়ালদহ থেকে গৌড় এক্সপ্রেস। রাত ১০.১৫ মিনিটে ছাড়ে। সময় লাগে ৮ ঘন্টা। এছাড়াও হাওড়া এবং শিয়ালদহ থেকে পাবেন দার্জিলিং মেল, সরাইঘাট এক্সপ্রেস, কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস, পদাতিক, কাঞ্চনকন্যা ছাড়াও আছে অনেক ট্রেন। কলকাতা থেকে মালদার সড়ক পথে দূরত্ব ৩১২ কিলোমিটার। ধর্মতলা থেকে অজস্র বাস প্রতিদিন মালদার উদ্দেশ্যে যায়। আবার মালদা থেকে কলকাতা ফেরার ট্রেনও আছে। সোম থেকে শনি সকাল ৪টে এবং ৬টা ১০মিনিটে ছাড়ে ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস।

থাকার জায়গা

মালদায় রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন দপ্তরের ট্যুরিস্ট বাংলো। **৩/২ বি বা দি বাগ (ইস্ট), কলকাতা-১** থেকে বুকিং করুন, **ফোনঃ ০৩৩-৪৪০১২৬৫৯**। এছাড়াও পাবেন ইংরেজ বাজার সংলগ্ন নানান হোটেল।

যাবার ভালো সময়

অক্টোবর থেকে মার্চ।

টুকরো খবর

নিষিদ্ধ করল ডিজিসিএ

স্পাইস জেট আর জেট এয়ারওয়েজের কাছ থেকে রিপোর্ট হাতে নিয়েই নিষিদ্ধ করা হল মার্কিন সংস্থার বোয়িং ৭৩৭ ম্যাক্স-এর সমস্ত বিমানকে। এমনকি যেসব বোয়িং ৭৩৭ ম্যাক্স বিমান গন্তব্যের উদ্দেশ্যে উড়ে গেছিল, তাদের বিকেল ৪টের মধ্যে অবতরণ করার নির্দেশও দেয় ডিজিসিএ। এছাড়াও রিপোর্ট হাতে পেয়েই একদিনে ১৪টি বিমানের উড়ান বাতিল করল স্পাইস জেট। এরপর তারা ঘোষণা করে, যাত্রীদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখেই তারা এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। প্রসঙ্গত, চার মাসের ব্যবধানে ঘটে যাওয়া বোয়িং ৭৩৭ ম্যাক্স বিমান দুর্ঘটনার জেরে প্রাণ হারাল শতাধিকের বেশি যাত্রী। তাই ডিজিসিএ আর কোনও ঝুঁকি না নিয়ে, দেশের দুই বেসরকারী বিমান সংস্থা স্পাইস জেট ও জেট এয়ারওয়েজ, বোয়িং কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পাওয়া বিমানের সবিস্তারে তথ্য চেয়ে পাঠায়। তারপরই ভারত থেকে বোয়িং ৭৩৭ ম্যাক্স নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এমনকি এই মার্কিন সংস্থার সাথে হওয়া চুক্তিও খারিজ করা হয়।

বারবার কেঁপে উঠছে আন্দামান

হঠাৎ হঠাৎ করেই কেঁপে উঠছে আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। রিখটার স্কেলে কম্পনমাত্রা কখনও ৪.৫ তো কখনও ৪.৮। সকাল ৬টা ৪৪ তো কখনও রাত ১টা ৫১। এখনও কোনও হতাহতের খবর নেই। তার জন্য এখনও পর্যন্ত কোনও সতর্কতাও জারি করা হয়নি। তবে পুরো বিষয়ের উপর নজর রাখা হচ্ছে।

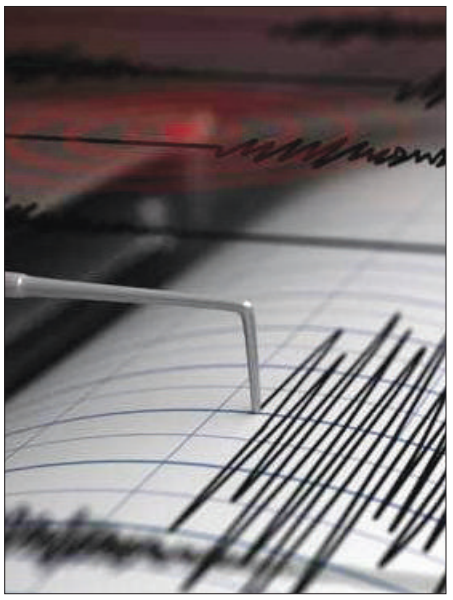

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ছোট মাপের ভূমিকম্প প্রায়ই হয়ে থাকে। কিন্তু ২০০৪ সালের ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘটনা কেউই ভোলেনি। তাই কপালে চিন্তার ভাঁজ একটা পড়ছেই। কিন্তু ভূমিকম্পের জেরে পর্যটকদের ভিড়ের কোনও খামতি ঘটেনি বলেই এখনও পর্যন্ত জানা যাচ্ছে।

খাবারের আকালে ধুঁকছে নিরীহ প্রাণ

তাদের মুখগুলো শুকিয়ে গেছে, দেওয়ালের এপারে থেকেই কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে কান্নার শব্দ, লোক দেখতে পেলেই তার পা জড়িয়ে ধরছে। এমনটাই রূপ ছিল আলিপুর জেলের। বেশ কিছুদিন আগেই আলিপুর সংশোধনাগারকে স্থানান্তর করা হয়েছে বারুইপুরে। বন্দিদের নিয়ে চলে গেলেও ফাঁকা জেলে কেঁদে মরছে সেখানে থাকা বিড়ালগুলো। জেলে যখন বন্দিরা ছিল, তখন তাদের খাওয়ার থেকেই বেশ ভালোভাবে পেট চলে যেত এখানকার বিড়ালগুলোর। কিন্তু যখনই এই স্থানান্তরের কাজ শুরু হয়, হেঁশেলে খাবার বাড়ন্ত হতে শুরু করে। শেষমেশ সবাই চলে গেলে একা পড়ে যায় বিড়ালগুলো। খাবারের অভাবে অসুস্থ হতে শুরু করে তারা। দুই বন্দি চিঠি লিখে আবেদন করে জানিয়ে ছিল বিড়ালগুলির ব্যবস্থা নিতে। অবশেষে একটি স্বেচ্ছাসেবি সংস্থা থেকে মোট ৮২টি বিড়ালকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় তারা, সাথে জানান, তাদের সংস্থায় বিড়ালগুলোকে খেতে দিতে এবং রাখতে কোনও অসুবিধা হবে না। যেসব বিড়ালগুলোকে তারা নিয়ে গেছে তাদের কয়েকজন খাবারের অভাবে অসুস্থ হয়ে গেছে, তাদের চিকিৎসা চলছে। এছাড়াও আরও যেসব বিড়াল ধরা সম্ভব হয়নি বা লুকিয়ে গেছে, তাদের জন্য আবারও যাওয়া হবে।

আগে থেকে আপনিও সতর্ক হন

প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে। সব থেকে দুঃখের বিষয় বাজ পড়ে মৃত্যুর সংখ্যা অকল্পনীয়ভাবে বেড়েই চলেছে। আর এই ঘটনা রোধ করতে পুনের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ মেটেরিওলজি বিশেষ প্রচেষ্টায় একটি অ্যাপ চালু করা হলো, নাম হল দামিনী। আপনি ফোনে ডাউনলোড করলেই বুঝে যাবেন ভারতের কোথায় কখন বাজ পড়ছে। বৃষ্টির সময় আপনি যদি রাস্তায় থাকেন অ্যাপটি খুলে দেখে নিতে পারবেন আপনার কাছাকাছি বাজ পড়ার পূর্বভাষ আছে কিনা। আশা করা যাচ্ছে, এই অ্যাপের ব্যবহারে বাজ পড়ে মৃত্যুর সংখ্যা কমানো সম্ভব।

পরিস্থিতি মানুষকে লড়াই করতে শেখায়

ভালো মন্দ, হাসি কান্না সব কিছুই একটা সময় পর্যন্ত ঠিক আছে। খুব বেশি বা খুব কম কোনও কিছুই ভালো না। অনুভূতিগুলো একটি অপরের পরিপূরক। তাই পরিস্থিতির সামনে হার মেনে না নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

জীবনটা পুরোটাই নির্ভর করছে ভারসাম্য বজায় রাখার ওপর। আমরা ছোটবেলাতেই চেষ্টা করতাম, আমাদের সমস্ত কাজকে টাইম টেবিলের ছকে ফেলে দিতে, যাতে করে খেলা, ঘুম, পড়াশোনা সব কিছুর মধ্যেই একটা ভারসাম্য বজায় থাকে। তবে আমরা যত বড় হয়েছি, জীবনের ভারসাম্যটাকে কোথায় হারিয়ে ফেলেছি। ছক তো হারিয়েছেই আর সময়টাও যেন সঙ্গ দেওয়া বন্ধ করে দেয় প্রায়শই।

এই প্রতিবেদন থেকে এমনই একজনের কথা জানব, যে সমস্যায় ভরা দিনগুলোতে, দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেলেও ভালো করে বেঁচে থাকার তাগিদে থেমে না গিয়ে, চেষ্টা চালিয়ে গেছে।

তার জন্ম মিটাইরাই-এর লুইসিয়ানাতে। তার নাম ‘এলেন ডিজিনারেস’। বাড়িতে ছিল বাবা, মা, ভাই। তার বাড়ির পরিবেশটা ছিল অন্যরকম, ধর্মের প্রতি অতিবিশ্বাসের কারণে, তাকে দিয়ে জোর করে প্রে করানো হত। একদিন হঠাৎই তার বাবা-মায়ের বিচ্ছেদ হয়ে গেল। তার মা একজন সেলসম্যানকে বিয়ে করে টেক্সাসে চলে যান। না যেতে চাইলেও মায়ের সঙ্গ দিতে হয় ১৩ বছরের ছোট্ট এলেন-কে। তার মায়ের সাথে সঙ্গ না দেওয়ার প্রথম কারণই ছিল, টেক্সাসে তার কোনও বন্ধু ছিল না। তারপরও নিজের মত করে সে মানিয়ে নিয়ে একটি ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করা শুরু করে। কিন্তু মূল সমস্যা শুরু হয়, যখন তার মা তৃতীয় বারের জন্য বিয়ে করেন। সেই লোকটি এলেনকে শারীরিক নির্যাতন করা শুরু করে। ভয়-রাগে এলেন বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে যায়। একা একা গাড়ির মধ্যে থাকলেও সে বাড়ির ভেতর যেতে কিছুতেই রাজি হয় না। নিউ অর্লিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে কমিউনিকেশন নিয়েই তার পড়াশোনা। কিন্তু বাড়ি ছেড়ে দেওয়ার কারণে তাকে নিজের খরচ নিজেকেই চালাতে হত আর সেই জন্য পড়াশোনাটাকে ছেড়ে দিতে হয়

তাকে। সে একটি রেস্টুরেন্টে ওয়েট্রেসের কাজ করত। সেখানেই এলেনের একটি ভালো বান্ধবী ছিল। একদিন তার বান্ধবীর সাথে খুব ঝগড়া হয়, তার কিছুক্ষণ পরই একটা গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে তার বান্ধবী মারা যায়। চরম একাকীত্বে ভুগতে শুরু করে এলেন। কিন্তু সেখান থেকেই তার ঘুরে দাড়ানো। তার প্রথম কমেডি স্কেচ ‘ফোন কল টু গড্’, যা স্টেজে উঠে তিনি সম্পাদনা করে। এই কমেডি স্কেচ তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। ১৯৮২ সালে আমেরিকায় তার পরিচিতি ঘটেছিল ‘সোটাইম ফানিয়েস্ট পারসন’ হিসাবেই। আর সেই নামেই আমেরিকার সমস্ত জায়গায় তিনি প্রোগ্রাম করেন। স্টেজ প্রোগ্রামের দরুণ ওপরাহ উইনফ্রে-এর টক শো’তে আসেন তিনি, যা সমগ্র ইউ.এস.এ-তে খ্যাতি এনে দেয়। এর কিছুদিন পর থেকে তার পরিচালনায় একটি টক শো শুরু হয়। কিন্তু তার ভাগ্যে ছিল অন্য কিছু। শো এর টিআরপি খারাপ হওয়ায় হঠাৎই শো বন্ধ হয়ে যায় এবং কোনও নোটিশ ছাড়াই হঠাৎ করেই টিভিতে কাজের দিন শেষ হয়ে যায় তার। এরপরই আবারও ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই শুরু করে এলেন। আমেরিকায় ৯/১১ জঙ্গিহানার কয়েক মাস পরেই এমি অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠিত হয়। তখনও কারোর মন থেকে ভয়, আশঙ্কা, শোক মুছে যায়নি, এমন সময় এত বড় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের পরিচালনা করেন তিনি। এর কয়েক বছর পরই আবার তার নিজের পরিচালনায় টিভিতে শুরু হয় একটি টক শো। যা বিশ্বজোড়া খ্যাতির সাথে ২৫টি পুরস্কারও পায়। কয়েকবছর পর আবারও তার ভাগ্য সঙ্গ ছাড়তে শুরু করে, শো-এর শুটিং চলাকালীন মেরুদন্ডে ব্যথার অনুভূতি হয়। মেরুদন্ডে কোনওভাবে লেগে যাওয়ার দরুন ডাক্তার তাকে তিন মাসের বেড রেস্টে থাকতে বলেন, কিন্তু না, আর থেমে না গিয়ে ব্যথার সামনে মাথা না ঝুঁকিয়ে দায়িত্ববান পরিচালকের মতো আবারও তার শো-এর শুটিং শুরু করে। ২০১৬ সালে প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অফ ফ্রিডম-এর খেতাব জেতে এলেন। তার বক্তব্য অনুযায়ী-

“মাই পয়েন্ট ইস, লাইফ ইস অ্যাবাউট ব্যালেন্স
দ্য গুড অ্যান্ড দ্য ব্যাড
দ্য হাই অ্যান্ড দ্য লো
দ্য পিনা অ্যান্ড দ্য কোলাডা”।

জীবনে ভারসাম্য বজায় রাখতে পারলেই, যেকোনও সমস্যার সমাধান করা যায়, সেটাই শিখিয়েছেন এলেন ডিজিনারেস। আজ তিনিই আমাদের এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা।

সুদক্ষ ফিজিওথেরাপিস্ট-ই পারে জীবনের গতি ফিরিয়ে আনতে

বাড়তে থাকা ব্যস্ততা বাড়িয়ে দিচ্ছে জটিল রোগ। যা ওষুধ খেয়ে বা বারবার ডাক্তারের কাছে গিয়েও ঠিক করতে পারবেন না। তাই ভরসা ফিজিওথেরাপিস্ট। এইভাবেই কি তাহলে বাড়ছে অন্য ধরণের জীবিকার প্রচলন। চলুন জেনে নিই।

দৈনন্দিন জীবনে কাজের চাপে শারীরিক সমস্যা বাড়ছে অপরিকল্পনীয়ভাবে। কাজের জন্য সকালে বেরোনো আবার রাতে বাড়ি ফিরেই এক জায়গায় চুপচাপ বসে থাকা, নয়তো খেয়ে নিয়েই ঘুম। নিজের শরীরের দিকে মনোযোগ না দেওয়া, ঠিক মতো খাওয়া-দাওয়া না করা, সব চেয়ে বড় বিষয় ব্যায়াম না করার কারণে শরীরের মধ্যে বাসা বাঁধছে অবাঞ্ছিত কিছু রোগ। যাদের হাত থেকে ওষুধ খেয়ে, ডাক্তার দেখিয়েও নিস্তার পাওয়া যায় না। তখন ছুটতে হয় একজনের কাছে, আর তিনি হলেন ফিজিওথেরাপিস্ট। শরীরে জমতে থাকা ব্যথা অথবা অসাড় অঙ্গকে ম্যাসাজ ও সঠিক চিকিৎসার মাধ্যম দিয়ে সুস্থ করে তুলতে পারে এরাই। শুধু কর্ম ব্যস্ত মানুষরাই নয়, খেলোয়াড় থেকে শুরু করে অভিনেতা, অভিনেত্রীরা সুস্থ হতে দারস্ত হন এদেরই কাছে। তাই ফিজিওথেরাপিস্টের চাহিদা যে কম নয় এবং উত্তরোত্তর বাড়ছে তা খুবই স্পষ্ট। তাই এই প্রতিবেদনে ফিজিওথেরাপিস্ট হওয়ার পদ্ধতিগুলো জানব। প্রথমেই দেখে নেব, একজন সফল ফিজিওথেরাপিস্ট হতে গেলে কি কি বিষয়ে দক্ষতার প্রয়োজন-

পড়া বোঝার দক্ষতা

প্রেসক্রিপশন পড়ে বুঝতে হবে রোগীর কি সমস্যা এবং কিভাবে চিকিৎসার প্রয়োজন।

দক্ষ শ্রোতা

শুধু ভালো বক্তা হলেই চলে না, বিপরীতে থাকা মানুষটির কথাও মন দিয়ে শোনার অভ্যাস করাটা প্রয়োজন।

লেখা

রোগীকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য ঠিকভাবে লিখতেও জানতে হবে।

বিজ্ঞান

সঠিক পড়াশোনা এবং প্র্যাকটিক্যাল কাজের মধ্যে দিয়ে বিজ্ঞান জানতে হবে। এমনকি বিজ্ঞানের আধুনিকরণগুলোর সম্পর্কেও স্পষ্ট ধারণা রাখতে হবে।

চিন্তাভাবনা

রোগীর সমস্যাগুলোকে এবং বিজ্ঞানের ব্যবহারকে নিয়ে তলিয়ে ভাবাটা জরুরী। তাতে চিকিৎসা করতে সুবিধা হবে।

মনিটারিং

রোগীর ভিড় থাকলেও প্রত্যেকটা রোগীর দিকে সমানভাবে নজর দেওয়াটা এবং তাদের চিকিৎসায় সাড়া দেওয়া ও না দেওয়ার বিষয়ে নজর রাখতে হবে।

এইগুলি প্রত্যেকটাই ফিজিওথেরাপি নিয়ে পড়তে-পড়তে শিখতে হবে। কিছুটা নিজের বুদ্ধিকেও কাজে লাগাতে হবে। তবে কিছু গুণের প্রয়োজন একজন দক্ষ ফিজিওথেরাপিস্টের। তথা- ■ **জ্ঞান**- পড়াশোনা শেষে কি কাজ করতে চলেছে এবং আদৌ সে কাজ করার জন্য উপযুক্ত কিনা সেই বিষয়ে নিজের জ্ঞান থাকার প্রয়োজন।

■ **ধৈর্য**- ফিজিওথেরাপি ২-৩ মিনিটের কাজ নয়। তাই কাজ শেষ করার ধৈর্য রাখতে হবে।

■ **ইতিবাচক**- যেকোনও পরিস্থিতিতে ইতিবাচক চিন্তা করতে হবে, নাহলে রোগীর ওপর মানসিক চাপ বাড়বে।

■ **বাস্তববাদী**- অবাস্তব ভাবিয়ে রোগীকে ঠিক করতে পারবে না, তো যেটা সত্যি সেটাকে নিয়েই এগিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করা উচিত।

■ **যত্নশীল**- রোগীর প্রতি কিছুটা যত্নশীল হওয়ার প্রয়োজন। না হলে চিকিৎসা করার সময় সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে।

■ **কথোপোকথন**- নিজের কথা বলার দিকে নজর দিতে হবে, যাতে করে রোগীকে চিকিৎসা করতে, তার বাড়ির লোকের মনোবল বাড়াতে পারা যায়। তাতে ভবিষ্যতে কাজ করতে সুবিধা হবে।

এই গুণগুলিকে নিজের মধ্যে গড়ে তুলতে হবে। এছাড়া তো পড়াশোনা করে নিজের দক্ষতা ও কাজ সংক্রান্ত সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে হবে। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ফিজিওথেরাপি নিয়ে পড়ানো হয়। বিভিন্ন কলেজ ও ইউনিভার্সিটিগুলি থেকে প্লেসমেন্ট দেওয়ারও ব্যবস্থায় থাকে।

কোথায় কোথায় ফিজিওথেরাপি শেখানো হয় জেনে নেব-

Apollo Physiotherapy College, Apollo Hospital Campus
Jubilee Hills, Hyderabad, Andhra Pradesh- 500033.

Pt. Deen Dayal Upadhyaya Institute for Physically Handicapped (Ministry of Social Justice & Empowerment, Govt. of India)
4, Vishnu Digamber Marg, New Delhi- 110002.

KJ Somaiya College of Physiotherapy
6th Floor, Ayurvihar Complex Eastern Express Highway, Somiya, Sion, Mumbai, Maharashtra- 400022.

Department of Physical Medicine and Rehabilitation
Christian Medical College, Dr. Ids Scudder Road, Vellore Tamil Nadu- 632004

চা-পান নিয়ে ছয়টি ভুল ধারণা ও প্রকৃত সত্য উদঘাটন

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকলেও চা পান করা নিয়ে প্রচলিত রয়েছে বেশ কিছু ভুল ধারণা। জেনে নিন কি সেই ভুল ধারণা।

প্রাচীন পানীয়গুলোর মধ্যে অন্যতম হলো চা। চিনের চিকিৎসা শাস্ত্রে চা ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হলেও পরবর্তীতে তা ধীরে ধীরে জনমানুষের পানীয়তে পরিণত হয়। জাপানে উদযাপিত হত চা উৎসব।

সকালের আড়মোড়া ভেঙে এককাপ চা দিয়েই শুরু হয় অনেকের দিন। ক্লান্তি দূর করা থেকে শুরু করে অতিথি আপ্যায়ন—সবকিছুতেই চায়ের সমান সমাদর। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকলেও চা পান করা নিয়ে প্রচলিত রয়েছে বেশ কিছু ভুল ধারণা। জেনে নিন এমনই ছয়টি ভুল ধারণা এবং প্রকৃত সত্য সম্পর্কে।

দুধ ও চিনি মেশালে চায়ের গুণ নষ্ট হয়

পলিফেনল পরিবারের কিছু উদ্ভিজ্জ উৎপাদনকে ফ্লেভনয়েড বলা হয়। এরা ঠিক পুষ্টি উপাদান নয়, কিন্তু এদের কিছু বিশেষ গুণ থাকার কারণে স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী বলে বিবেচনা করা হয়। যেমন, জ্বালাপোড়া কমানো, ক্যানসার প্রতিরোধের ক্ষমতা, ভাসকুলার ফাংশন ঠিক রাখা, এলডিএল কোলেস্টেরলের অক্সিডেশন মন্থর করা ইত্যাদি। এটা ধারণা করা হয় যে, দুধের প্রোটিনের কারণে ফ্লেভনয়েড-এর কার্যক্ষমতা কমে যায়। আর এ কারণেই দুধ চা পান করলে ফ্লেভনয়েড কম পাওয়া যায়।

কিন্তু বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে, চায়ে দুধ যুক্ত হবার পরেও (২৫ শতাংশ পর্যন্ত) ফ্লেভনয়েড-এর উপস্থিতিতে কোনো প্রভাব পড়ে না, কিন্তু এর প্রভাবকে বিলম্বিত করে। অন্যদিকে, চায়ে দুধ মেশালে তা ফ্লেভনয়েড শোষণে কোনো প্রভাব ফেলে না। তবে দুধ মেশানোর কারণে চায়ে ক্যালোরির পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং দাঁতেরও ক্ষতি করে।

গ্রিন-টি বেশি স্বাস্থ্যসম্মত

মূলত গ্রিন-টি এবং ব্ল্যাক-টি একই গাছ থেকে আসে এবং স্বাস্থ্যগত উপকারিতা দেয়। এই দুই ধরণের চায়ের সার্বিক ফ্লেভনয়েড-এর মাত্রা একই কিন্তু প্রকার ভিন্ন। গবেষণায় দেখা গেছে, গ্রিন-টি যেখানে ওজন কমানো ও ক্যানসার প্রতিরোধে সাহায্য করে, সেখানে ব্ল্যাক-টি কার্ডিওভাসকুলার এবং মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি করে।

এ ক টি মেটাঅ্যানালাইসিসে দেখা গেছে যে, প্রতিদিন তিন বা আরো বেশি কাপ চা পান করা হার্টের জন্য উপকারী। সব মিলিয়ে প্রতিদিন আট কাপ পর্যন্ত চা পান করা নিরাপদ ক্যাফিন মাত্রার মধ্যে পড়ে। তবে দুধ চা বেশি না খাওয়াই ভালো।

চা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর

এটা বলা হয় মূলত চা-এ উপস্থিত ক্যাফিনের কারণে। এমনিতে কফির তুলনায় চা পাতায় ক্যাফিনের পরিমাণ বেশি থাকে। কিন্তু প্রক্রিয়াজাতকরনের পদ্ধতির কারণে ক্যাফিনের পরিমাণ কফির তুলনায় প্রায় অর্ধেক হয়ে যায়। প্রতি ২০০মিলি ব্ল্যাক-টি-তে ৫০ মিলিগ্রাম ক্যাফিন থাকে। গ্রিন-টি-তে এই পরিমাণটা আরো কম। প্রতিদিন এক থেকে আট কাপ চা পান করলে যে পরিমাণ ক্যাফিন শরীরে প্রবেশ করে তার মাত্রাটা প্রতিদিন পাঁচ কাপের বেশি চা পান করা উচিত নয়, নিরাপদ।

চা 'মুড'কে প্রভাবিত করতে পারে না

চা পান করলে মন ভালো হয় কি না, তা নিয়ে রয়েছে নানা মুনির নানা মত! গবেষণায় দেখা গেছে, চায়ে থিয়ানিন নামক এক ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিড পাওয়া যায়, যা প্রশান্তি দিতে পারে। চায়ে যে পরিমিত পরিমাণ ক্যাফিন থাকে তা ক্লান্তি দূর করতে সাহায্য করে এবং মেজাজ উৎফুল্ল করে তোলে।

চা জলের চাহিদা পূরণ করতে পারে না!

অন্যান্য পানীয়ের মতো চা-ও শরীরের জলের চাহিদা পূরণ করতে পারে। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতিদিন চার কাপ চা সমপরিমাণ জলের চাহিদা পূরণ করে থাকে।

চা ছোটদের জন্য নিরাপদ নয় !

চিনি ছাড়া চা একটি স্বাস্থ্যকর পানীয়। তাই ছোটদের জন্য তা মোটেও ক্ষতিকর নয়। কানাডিয়ান বিশেষজ্ঞদের মতে, ৪-৬ বছরের শিশুদের জন্য দিনে ৪৫ মিলিগ্রাম, ৭-৯ বছরের জন্য ৬২.৫ মিলিগ্রাম, এবং ১০-১২ বছরের জন্য ৮৫ মিলিগ্রাম পর্যন্ত ক্যাফিন সেবন মাত্রা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তার মানে হলো, একজন শিশু প্রতিদিন এককাপ চা পান করতেই পারে।

গরমে নিজেকে শীতল রাখার কিছু উপায়

গ্রীষ্মের তাপপ্রবাহের জেরে প্রাণ ওষ্ঠাগত, একটু বৃষ্টির দেখা মিললেও ভয়ঙ্কর গরমের কাছে তা কিছুই নয়।

এই গরমে শিশু থেকে বয়স্ক সবাই নাজেহাল। সকালে রাস্তায় বেরোলেই রোদের তাপে র‍্যাশ বেরোছে সারা গায়ে। আবার গায়ের কোনও জায়গায় কালো ছাপ পড়ে যাচ্ছে। সারাক্ষণ এসির মধ্যে থাকলেও গা-হাত-পা জ্বালা করে যাচ্ছে। এই ধরণের সমস্যা কমবেশি দেখেই থাকি। আবার দেখা যায়, গরমে অতিরিক্ত তেল বেরোচ্ছে মুখ থেকে। মুখটা চিটচিট করছে - এই ধরণের সমস্যা প্রায়শই গরমে দেখা যায়।

গরমের এই সমস্যাগুলো থেকে বাঁচতে কয়েকটি পন্থা অবলম্বন করা যেতেই পারে। সেগুলি হল

জামাকাপড়

গরমের দিন জামাকাপড় কেনার সময় বা পরার সময় দেখে নিন, কাপড়টি সুতির কিনা। সুতির কাপড় না হলে গায়ে ঘাম জমতে থাকবে। ফলে র‍্যাশ বা ঘামাচি বেরোনোটা খুব স্বাভাবিক হয়ে যায়। তাই কাপড়টি ভালো করে যাচাই করে নিন।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা

সকালবেলা স্নান করাটা আমাদের প্রত্যেকেরই অভ্যাস। কিন্তু ঠান্ডা লেগে যাওয়ার ভয় দ্বিতীয়বার স্নান করতে চাই না। কিন্তু যাদের মাত্রাতিরিক্ত ঘাম হয়, তারা দিনে দুবার স্নান করতেই পারে। আর চেষ্টা করবেন, অতিরিক্ত ঘাম যাদের হয়, তারা এক জামাকাপড় রোজদিন পরবেন না। হালকা জলে ধুয়ে শুকিয়ে নিয়ে তারপর পরুন।

অতিরিক্ত যত্ন

মুখে অতিরিক্ত ঘাম হলে, তেল বেরোতে থাকলে, ঠান্ডা জল দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন। গোলাপ জল আর সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন। ট্যান পড়ে গেলে টকদই মুখে লাগান। সময় কম থাকলে টমেটোর

রস লাগিয়ে ধুয়ে ফেলুন। রৌদ্রের দাপটে হওয়া কালো দাগের হাত থেকে মুক্তি পাবেন।

এসির মধ্যে থাকলেও যদি গা-হাত-পা জ্বালা করে, তাহলে কাজের ফাঁকে মুখ ও ঘাড় ঠান্ডা জলে ধুয়ে নিন। পাউডার মেখে লোমকূপের মুখ বন্ধ করে দেবেন না। বাড়িতে থাকলে পাউডার মাখতেই পারেন।

গরমের খাবার-দাবার

গরমে নিজের শরীরের প্রতি অনেক বেশি যত্নশীল হতে হয়। কারণ, এই সময় বিভিন্ন ধরণের পেটের অসুখ দেখা দেয়। কম জল খাওয়ার সাথে বাইরের থেকে খাবার খাওয়ার জন্যই এমন হয়।

গরমে খাবার খাওয়ার সময় কয়েকটা জিনিস লক্ষ্য রাখবেন

- যতটা সম্ভব কম তেল মশলা খাবার খাওয়ার চেষ্টা করবেন।
- বাইরের খোলা ও কাটা ফল খাবেন না।
- সকালে খালি পেটে ফল খান, অসময়ে ফল খাবেন না।
- যতটা সম্ভব রসাল ফল খাওয়ার চেষ্টা করুন।
- পর্যাপ্ত খাবার খান।
- বেশি বেশি জল পান করুন।
- খাদ্য তালিকায় অবশ্যই বাড়িতে পাতা টকদই রাখুন।
- রাস্তায় বেরোনোর সময় ছাতা ও সানগ্লাস সবসময় কাছে রাখুন।
- গরম থেকে এসে সাথে সাথে জল পান করবেন না, কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে গ্লুকোন-ডি বা নুন-চিনির শরবত খান।
- ফ্রিজের ঠান্ডা জল সবসময় খাবেন না।

এছাড়াও গরমের হাত থেকে বাঁচার সবচেয়ে ভালো উপায় মাথা ঠান্ডা রাখুন।

এই সব পন্থাগুলো অবলম্বন করলে এই বছরের গরমকে হার মানাতে পারবেন। নিজেও গরমকে হার মানান এবং অন্যদেরও গরমের হাত থেকে বাঁচান। কাজের ক্ষেত্রে বা বাড়িতে মাথাটা ঠান্ডা রাখলে গরমে কম কষ্ট হবে।

ত্বকের সঙ্গী হোমিওপ্যাথি

রোজকার ধূলোবালি, বায়ুদূষণ, খাওয়া-দাওয়ায় অনিয়ম এবং বাজার চলতি নামিদামি ক্রিম ও সাজ-সরঞ্জামের কোপে পড়ে ক্ষতি হচ্ছে আমাদের ত্বক। এই ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পেতে আর দেরি না করে হাত ধরুন হোমিওপ্যাথির।

নিজেকে সকলের সামনে শুধু উপস্থাপনযোগ্য করলেই হবে না, করে তুলতে হবে আরও বেশি সুন্দর এবং আরও বেশি আকর্ষণীয়। আর এই দৌড়ে শামিল হতে গিয়ে আমরা নিজেরাই নিজেদের অজান্তে আমাদের ত্বকের নানান ক্ষতি করে ফেলি। আর এই ক্ষতির পরিমাণ অনেকাংশে বাড়াতে সাহায্য করে রোদ, দূষণ, ধূলোবালি, তাছাড়া রাস্তার মশলাদার খাবার, খাবারে অনিয়ম, পর্যাপ্ত জল না খাওয়া ইত্যাদি। আর একবার যদি ত্বকে দেখা যায় ব্রণ বা ফুসকুড়ি বা অন্য কোনো ধরণের স্কিন র‍্যাশ, ব্যস, তাহলে তো আর কোনো কথাই নেই, শুরু হয়ে যায় বাজার থেকে নানান নামিদামি ক্রিম কেনা। একের পর এক ত্বকের উপর পড়তে থাকে ক্রিমের প্রলেপ। নিজের ত্বকের ধরণ না জেনেই চলতে থাকে নানান ধরণের গবেষণা। ফলস্বরূপ বাড়তে থাকে আপনার ত্বকের ক্ষতির পরিমাণ। সাম্প্রতিক সোসাইটি অফ ডার্মাটোলজি স্কিনকেয়ার স্পেশালিস্ট (এস.ডি.এস.এস.)-এর গবেষণায় দেখা গেছে যে, প্রায় ৮৮ শতাংশ নারীরা তাদের ত্বকের ধরণ এবং তার উপযুক্ত পণ্য বা ক্রিম জানেন না। এটি অবশ্য বিস্ময়কর নয় যে, বিভিন্ন ধরণের সমস্যার জন্য বাজারে অজস্র 'মাস্ট-ডু' অথবা 'মাস্ট-হ্যাভ' জাতীয় সমাধান রয়েছে।

কিন্তু শিকড় থেকে সমস্যাকে নির্মূল করতে হবে আর যদি তা না পারেন তাহলে সমস্যা আপনার ভেতরেই থেকে যাবে এবং কিছু সময় বিরতির পর আবারও ফিরে আসবে সেই সকল সমস্যা। অতএব সমস্যাকে নির্মূল করতে হবে গোড়া থেকে। শুনতে অবাক লাগছে তো? কিন্তু কিভাবে ত্বকের সমস্যার সমাধান করবেন ভিতর থেকে? কিভাবে নির্মূল করবেন ত্বকের নানাবিধ সমস্যাকে? আদৌ কি সম্ভব রোজকার দূষণ, ধূলোবালি, রোদ ও নানান ক্রিমের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া ত্বককে পুনরায় উজ্জ্বল, দাগ মুক্ত ও প্রাণবন্ত করে তোলা? শুনতে অবাক হলেও সত্যি তা সম্ভব। আর এই অসাধ্যসাধন সম্ভব তাও আবার হোমিওপ্যাথির হাত ধরেই। তবে ধৈর্য্য হারালে চলবে না, ভালো কিছু পেতে হলে ধৈর্য্য তো একটু ধরতেই হবে। সমস্যা যখন একদিনে হয়নি তখন তার সমাধানও একদিনে হবে না। সমস্যা হতে যেমন সময় লেগেছে ঠিক তেমনই সমস্যার সমাধান হতেও বেশকিছু সময় লাগবে। আর এর মাঝে কোনো রকম অবহেলা বা অনিয়ম করা একেবারেই চলবে না। আসুন, এবার জেনে নেওয়া যাক স্কিন র‍্যাশের ক্ষেত্রে অতি ব্যবহৃত ও প্রচলিত কিছু হোমিওপ্যাথি ওষুধ সম্বন্ধে -

হেপার সালফিউরিস বা হেপার সালফার

এই ওষুধটি ব্রণ, ঘা বা ত্বকের ফাটল নিরাময় করতে ব্যবহৃত হয়।

নেট্রাম মুরিটিকম

এই ওষুধের প্রধান খনিজ উপাদান হলো সোডিয়াম ক্লোরাইড বা সাধারণ লবণ। ফোস্কা এবং রোদে পোড়া দাগ বা র‍্যাশ নিরাময়ে অব্যর্থ ওষুধ।

আর্সেনিক অ্যালবাম

ডাইলিউটেড আর্সেনিক ট্রিক্সাইড ব্যবহার করা হয় এই ওষুধ তৈরিতে। যতক্ষণ না আর্সেনিকের স্বাদ যায় ততক্ষণ পর্যন্ত পাতলা করা হয়ে থাকে। আর্সেনিকের বিষাক্ততা হ্রাসের ক্ষেত্রে এটি একটি অব্যর্থ ওষুধ।

নাইট্রিকাম অ্যাসিড

এটি একটি খনিজ অ্যাসিড যা নাইট্রিকাম অ্যাসিড মার্ট হিসাবে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। এই ওষুধ সাধারণত ঘাম থেকে হওয়া র‍্যাশ, মুখে ও গালের ভিতরে হওয়া ঘা- এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

তবে উপরে যে ওষুধগুলোর বর্ণনা দেওয়া আছে, তা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিচয়। এই পরিচয়কে ভিত্তি করে কেউ কোনো ওষুধ নিজে নিজে সেবন করবেন না। সঠিক ওষুধ সঠিকভাবে খেয়ে উপকার পেতে, অতি অবশ্যই কোনো অভিজ্ঞ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন।

লক্ষ্য যখন শতায়ু

রোজকার ব্যস্ততার, মানসিক চাপ, খাওয়া-দাওয়ায় অনিয়ম ও শরীর চর্চায় অনিয়ম থাকা সত্ত্বেও যদি কিছু জিনিসকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করে নিতে পারেন, তাহলে আপনিও হতে পারেন শতায়ুর অধিকারী

অনেকেই স্বপ্ন দেখেন শত বছর বেঁচে থাকার। তাই হয়তো একে অপরকে শুভকামনা করতে গিয়ে প্রার্থনা করে বলে 'শত বছর বেঁচে থাকো'। কিন্তু বললেই তো শত বছর বেঁচে থাকা যায় না। রোগ-শোক, প্রাকৃতিক পরিবেশ কত কি মানুষের আয়ু কমিয়ে দেয়। তবে কিছু উপায় আছে যেগুলোকে মেনে চললে আয়ু কমে না বাড়ে। জেনে নিন সেসব উপায়, যা মানলে বেঁচে থাকতে পারবেন শত বছর।

ধূমপানকে না

যদি আপনি টানা চারবছর ধূমপান করেন তাহলে আপনার ২টি অ্যাটাক হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়। আর দশ বছর পর হতে পারে ক্যানসার। পনের বছর পর শারীরবৃত্তিক কর্মকান্ডের ক্ষমতা কমে যায়। তাই ধূমপান ছাড়ুন, জীবনের আয়ু বাড়ান। ধূমপায়ী নারীদের বন্ধ্যাত্ব এবং সন্তান প্রসবে নানান সমস্যা দেখা দিতে পারে। দেখা গেছে, একটি সিগারেট জ্বালালে প্রায় ৭ হাজার বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ বের হয়। তাই ধূমপানকে অকাল মৃত্যুর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। ধূমপানের কারণে বিশ্বজুড়ে প্রতি ১০ জনের মধ্যে একজন মারা যাচ্ছে।

প্রতিদিন শরীরচর্চা

প্রতিদিন শরীরচর্চা করুন, নিয়মিত ত্রিশ মিনিট করে হাঁটুন। শরীরচর্চা, শরীরের পাশাপাশি মস্তিষ্ককেও ভালো থাকতে সহায়তা করে নানাভাবে। এছাড়া মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতিসহ স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করে। ব্রিটেনের বাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় দেখা গেছে, খালি পেটে শরীরচর্চা করার ফলে বেশি মেদ ঝরানো সম্ভব হয়। সপ্তাহে ১৫০ মিনিট শরীরচর্চা ৩১ শতাংশ মৃত্যুর ঝুঁকি কমিয়ে দেয়। অপর এক গবেষণায় দেখা গেছে, সপ্তাহে ৪৫০ মিনিট হাঁটা জীবনের আয়ু সাড়ে চার বছর বাড়িয়ে দেয়। প্রতি দুই বছরে ৭৫ মিনিট করে আয়ু যোগ করে।

সবজি ও ফল খান নিয়মিত

প্রতিদিনের খাবারের তালিকায় রাখুন শাক-সবজি ও ফল। অস্ট্রেলিয়ার সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা বলেছেন, দৈনিক পাঁচ থেকে সাত রকম ফল ও সবজি খাবারে যুক্ত করলে মানসিক চাপ ২৩ শতাংশ পর্যন্ত কমে। সে তুলনায় যারা দিনে দুই রকম ফল খান তাদের মানসিক চাপের ঝুঁকি ১৬ শতাংশ কম থাকে।

পর্যাপ্ত ঘুম

প্রতিদিন কমপক্ষে ৭ থেকে ৮ ঘন্টা ঘুমবেন। যদি পর্যাপ্ত ঘুম না হয় তাহলে হৃদরোগ, ক্যানসার সহ বিভিন্ন রোগের ঝুঁকি বেড়ে যায়। বিশ্বের ১৫০টি গবেষণা পর্যালোচনা করে দেখা যায়, কম

ঘুমের কারণে ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ এবং মোটা হয়ে যাবার সম্পর্ক আছে।

রক্তচাপ স্বাভাবিক রাখুন

নিয়মিত চেকআপে রাখুন আপনার রক্তচাপ। উচ্চ রক্তচাপ হলে কমানোর ব্যবস্থা, কমে গেলে পর্যাপ্ত রাখার ব্যবস্থা করা। মোট কথা রক্তচাপ ১২০/৮০- এর ভিতরে রাখুন। যেসব কারণে বা খাবারে রক্তচাপ বাড়িয়ে দেয় তা নিয়ন্ত্রণ করুন।

পরিবারকে সময় দিন

মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে পরিবারের সাথে যোগাযোগ রাখুন। কাছের মানুষদের সাথে আড্ডা দিন। বন্ধু ও পরিবারের সাথে ঘুরতে যান। সামাজিক হোন। গবেষণায় দেখা গেছে, যারা শতায়ু হয়েছেন তাদের বেশির ভাগ বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের সাথে সুসম্পর্ক ছিলো, যাদের সামাজিক বন্ধন ভালো, তাদের ৫০ শতাংশ জীবনের আয়ু বেড়ে যায়।

মেদ কমান

মেদ বা চর্বি হলো রোগের প্রজনন কেন্দ্র। তাই চর্বি থেকে দূরে থাকুন। তার জন্য চর্বিযুক্ত খাবার থেকে বিরত থাকুন। রক্তের চর্বির মাত্রা নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন নিয়ে আসুন। রক্তে অতিরিক্ত চর্বির কারণে হৃদরোগ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি বেড়ে যায়।

ডিপ্রেশন বা বিষন্নতাকে না

মনের গভীরে কোনোভাবেই বিষন্নতাকে জায়গা দেওয়া যাবে না। এই রোগ হলেই চিকিৎসকের কাছে যান। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্বে প্রায় ৬২ কোটি মানুষ বিষাদগ্রস্থতা ও দুশ্চিন্তাজনিত মানসিক রোগে ভুগছেন। বিষন্নতা ৩০ শতাংশ অকাল মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়।

চাপ ব্যবস্থাপনা

চাপ নেওয়ার ক্ষমতা তৈরি করুন। যত চাপ ব্যবস্থাপনা সুন্দরভাবে করতে পারবেন, তত নিজের জীবনের আয়ু বাড়াতে পারবেন। ক্রমাগত চাপের মধ্যে জীবনযাপন করলে ৪ থেকে ৮ বছর আয়ু কমে।

জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ

জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করুন। তা অর্জন করার চেষ্টা করুন। এমন লক্ষ্য ঠিক করুন যা আপনার ক্ষমতার চেয়ে বড়।

ইতিবাচক চিন্তা করুন

যেকোনও অবস্থায় ইতিবাচক চিন্তা করুন। এতে করে হতাশা আসবে না। গবেষণায় দেখা যায়, যারা ইতিবাচক চিন্তা করেন গড়ে সাত বছর বেশি বাঁচেন।

প্রচুর জল খান

প্রতিদিন ন্যূনতম ২ থেকে ৩ লিটার জল পান করতে হবে। আমাদের শরীরের তিন ভাগের দুই ভাগই জল দিয়ে তৈরি। তাই শরীরের প্রতিটি কাজের জন্য জল জরুরি। জল শরীরের দূষিত পদার্থ বের করে দিতে এবং হজম ভালো রাখতে সাহায্য করে। তাই কম জল পান জটিল ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যা তৈরি করে।

Madhurima PRINTERS
House of Complete Printing Solutions
All Kinds of Commercial Designing & Printing
FLEX • DIGITAL • OFFSET • T-SHIRT • MUG PRINT
17 Pataldanga Street, Kolkata-700009
Ph.: 87776 21552 / 91430 75675
E: madhurimaprinters@gmail.com

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বিহেভিয়ারাল সায়েন্স-এর পক্ষে ডা. কেদার রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা পি-৭ সি আই টি রোড, মৌলালি, কলকাতা-৭০০০১৪ থেকে 'অ্যাঞ্জেল' প্রকাশিত ও মুদ্রিত • মধুরিমা প্রিন্টার্স থেকে মুদ্রিত • ফোনঃ ২২৮৬-৭০৩৮, E-mail: angelpublishers@gmail.com • **সম্পাদক ঃ কেদার রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়** • RNI No. WBBEN/2009/34317